যতটা সঞ্চয় ছিল, তাতেই শিল্প হতে পারত

মৈত্রীশ ঘটক ও অমিতাভ গুপ্ত

গত বছর পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে মোট যত বিনিয়োগ হয়েছে, সারদা গোষ্ঠী বাজার থেকে তার ৬৪ গুণ টাকা তুলেছিল। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গের পুঁজি ছিল। যদি রাজনীতিকরা নিজস্ব পন্‌জি স্কিম না চালাতেন, হয়তো সেই টাকাই রাজ্যের শিল্প-মানচিত্র বদলে দিতে পারত।

উন্নয়নের বদলে। পানাগড়ের মাটি উৎসবের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। *ছবি: অশোক মজুমদার*

সুদীপ্ত সেনের ‘সাফল্য’-র গল্পটা ঠিক কী, সেটা শিব্রাম চক্রবর্তী টের পেয়েছিলেন। তাঁর এক গল্পে তিনি প্রথমে হর্ষবর্ধনের থেকে একশোটা টাকা ধার করেছিলেন। তার পর, গোবর্ধনের থেকে ধার করে হর্ষবর্ধনকে শোধ করেছিলেন। ফের হর্ষবর্ধনের থেকে ধার করে গোবর্ধনকে শোধ। এ ভাবেই চলছিল। কিন্তু শিব্রামই হাঁফিয়ে উঠলেন। দু’ভাইকে ডেকে তিনি বলে দিলেন, হর্ষবর্ধনবাবু ভাইকে মঙ্গলবার একশো টাকা দেবেন, আর গোবর্ধন শুক্রবার দাদাকে একশো টাকা। আমার আর এই ছোটাছুটি পোষাচ্ছে না।

টাকার হাতবদল

শিব্রামের নির্দোষ মজার গল্পের সঙ্গে সুদীপ্ত সেনের মারাত্মক জালিয়াতির ফারাক যে প্রচুর, সে কথা বলে দিতে হয় না। তবে মিল একটা জায়গায়—এক জনের লাভ দাঁড়িয়ে থাকে আর এক জনের ক্ষতির ওপর। অর্থনীতির পরিভাষায় এই জাতীয় প্রকল্পকে ‘জিরো সাম গেম’ বা শূন্য অঙ্কের খেলা বলা হয়ে থাকে। এই খেলায় শুধু টাকার হাতবদলই ঘটে, যাকে বলে রিডিস্ট্রিবিউশন বা পুনর্বণ্টন; কোনও অর্থনৈতিক ভাবে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ হয় না, ফলে তার থেকে কোনও উদ্বৃত্তও তৈরি হয় না। যত ক্ষণ না উদ্বৃত্ত তৈরি হচ্ছে, তত ক্ষণ সবার পক্ষে লাভ করা সম্ভবই নয়।

ব্যাঙ্কে টাকা রাখার সঙ্গে জালিয়াত সংস্থায় টাকা রাখার ফারাক এখানেই। ব্যাঙ্কে আপনি যে টাকা জমা রাখবেন, সেই টাকা আর কেউ ধার নিয়ে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ করবেন, অথবা অন্য কোনও প্রয়োজনে ব্যয় করবেন যেটা শেষ পর্যন্ত কোনও উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পৌঁছোবে (যেমন, তিনি যদি টাকাটা বাড়ি তৈরি করতে ব্যয় করেন, তবে সেই টাকা ইঁট, সিমেন্ট, বালি ইত্যাদি কিনতে ব্যয় হবে, মজুরিতে যাবে)। তিনি ব্যাঙ্ককে সুদ দেবেন। ব্যাঙ্ক তার থেকে নিজের লাভ রেখে আপনাকেও সুদ দেবে।

সরকারি পন্‌জি স্কিম

পন্‌জি স্কিম নিয়ে মূল সমস্যা, তারা টাকাটা কোনও উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে পৌঁছোতে দেয় না। আমাদের রাজনীতি যে পথে চলছে, সেটাও এক রকম পন্‌জি স্কিমই বটে। যে কোনও সরকার সাধারণ মানুষের থেকে টাকা তোলে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, দুই ধরনের করের মাধ্যমে। সেই টাকা কী ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটাই প্রশ্ন। কিছু টাকা বণ্টন করতেই হয়, সেটা সরকারের সামাজিক দায়িত্ব। যেমন, দারিদ্র দূর করার জন্য সরকার যখন কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করে, তার জন্য টাকা রাজকোষ থেকেই আসবে।

কিন্তু, সরকার কি শুধু সেটুকুতেই থেমে আছে? হরেক অপ্রয়োজনীয় খাতে খরচ চলছে— উৎসব, অনুষ্ঠান, ক্লাবে-ক্লাবে টাকা বিলি। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি এই সরকারের উদ্ভাবন নয়— ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। এই যে টাকা খরচ হচ্ছে, এটা নিতান্তই পুনর্বণ্টন। এর থেকে কোনও অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত তৈরি হচ্ছে না। এটা নিখাদ সুদীপ্ত সেন মডেল— এক জনের থেকে টাকা নিয়ে তা আর এক জনকে দেওয়া হচ্ছে। একটা ফারাক আছে অবশ্য— সুদীপ্তকে যাঁরা টাকা দিয়েছিলেন, তাঁরা স্বেচ্ছায় দিয়েছিলেন। কর দিতে আমরা বাধ্য।

আর পাঁচটা পন্‌জি স্কিমে যা হয়, সরকারেরও তা-ই হচ্ছে— টাকার অভাব। ফলে, গোড়ায় এক খাতে বরাদ্দ হওয়া টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। তাতেও না কুলোলে সরকার ঋণ করতে বেরোচ্ছে বাজারে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। সরকার আজকের খয়রাতির জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে হাত পাতছে। সরকারি ঋণ মানে তো তা-ই— কাউকে না কাউকে, কোনও না কোনও সময় তো কর দিয়ে সেই ঋণ শোধ করতেই হবে।

আর্থিক পন্‌জি স্কিমই হোক বা রাজনৈতিক, কোনও না কোনও সময় তাকে প্রতিশ্রুতি ভাঙতেই হবে। রাজনৈতিক নেতারাও ভাঙেন। তাঁরা যে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখান, শেষ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছোনো যায় না। এর ফল, বিশ্বাসভঙ্গ। সাধারণ মানুষ যে এজেন্টদের বিশ্বাস করে তাঁদের হাতে নিজেদের ব্যাঙের আধুলি তুলে দিয়েছিলেন, সেই এজেন্টরা যে সংস্থাকে বিশ্বাস করে জড়ো করে আনা টাকা তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করেছিলেন, সেই বিশ্বাসের শৃঙ্খল পশ্চিমবঙ্গে টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে আছে এখন। মানুষের অভিজ্ঞতায় থেকে গেল এই বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষত। ভবিষ্যতে আর কাউকে বিশ্বাস করার সময় তারা অনেক বেশি সতর্ক হবে। হয়তো প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। তাতে অর্থনীতির স্বাস্থ্য ধাক্কা খেতে বাধ্য।

সরকারের একটা মস্ত দায়িত্ব— করদাতাদের টাকা যাতে উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে যায়, তা নিশ্চিত করা। রাজ্য যাতে অর্থনৈতিক ভাবে উৎপাদনশীল হয়ে উঠতে পারে, তার পরিকাঠামো তৈরি করা। পশ্চিমবঙ্গের সরকার ঠিক তার উল্টো কাজটা করছে। বর্তমান সরকার বিগত জমানার ভ্রান্ত নীতি শুধু অনুসরণই করেনি, শিল্পের জন্য জমি নিয়ে অবাস্তব নীতি আঁকড়ে ধরে তাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে। জমি নিয়ে অশান্তি, শ্রমিক অশান্তি তো আছেই, তার পাশাপাশি আছে তোলাবাজির এবং উৎকোচের সমস্যা। তোলার সমস্যার দুটো দিক— এক, এটা একটা বাড়তি ‘কর’, যা বিনিয়োগকারীদের মুনাফার পরিমাণ কমিয়ে দেয়; দুই, এই কর অনিশ্চিত, অর্থাৎ কে, কখন, কত টাকা তোলা দাবি করবে, সেটা জানা না থাকায় তাকে হিসেবের মধ্যে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, তোলা আদায়ের প্রবণতা যত বাড়ে, বিনিয়োগকারীরাও টাকা লগ্নি করতে ততই অনিচ্ছুক হয়ে ওঠেন।

অথচ, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পই একমাত্র সম্ভাব্য পথ। জমির অভাব তাই কৃষির পথে বেশি দূর হাঁটার উপায় নেই। অন্য দিকে উদ্বৃত্ত শ্রমিকের সমস্যা। অতএব, এই রাজ্যে যদি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা যেত, তবে প্রভূত কর্মসংস্থান হত, অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বাড়ত, উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হত। করদাতারা যে টাকা রাজকোষে জমা করেন, বিভিন্ন পথে তার চেয়ে বেশি টাকা তাঁদের পকেটে ফিরে যেত। সরকারের কাজকর্ম যাতে পন্‌জি স্কিমে পরিণত না হয়, সেটা নিশ্চিত করার এটাই একমাত্র পথ। কিন্তু দলপন্থী বা বদলপন্থী, কোনও সরকারই সে পথে হাঁটতে সক্ষম হয়নি।

বিষচক্র

কেউ বলবেন, সমস্যাটা পুঁজির অভাব। এটা ঠিক যে এই রাজ্যে বড় মাপের বিনিয়োগ করার মতো পুঁজিপতি নেই। কিন্তু চাইলে যে বাজার থেকে টাকা তোলা সম্ভব, সেটা তো সুদীপ্ত সেন দেখিয়েই দিলেন। অনুমান করা যায়, তিনি বাজার থেকে অন্তত ২০,০০০ কোটি টাকা তুলেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে শালবনিতে জে এস ডব্লিউ-র ইস্পাত কারখানা ছাড়া এত বড় অঙ্কের বিনিয়োগ প্রস্তাবও আর একটা নেই। এবং, গত বছর পশ্চিমবঙ্গে মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৩১২ কোটি টাকা। এই নিরিখে সুদীপ্ত সেনের সংগ্রহের পরিমাণ বিপুল। কাজেই, এই রাজ্যে পুঁজি নেই, দেশি-বিদেশি পুঁজি আমদানি না করলে চলবে না, এটা বলা ঠিক হবে না।

আসলে, মানুষের হাতে অল্প পরিমাণে হলেও কিছু সঞ্চয় আছে। তাঁরা সেই টাকা এমন কোথাও রাখতে চান, যেখান থেকে তাঁরা মূল্যস্ফীতির হারের চেয়ে বেশি হারে সুদ পাবেন। দেশের সম্মিলিত ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের ২২ শতাংশ আসে এই রাজ্য থেকেই, যা দেশের আয়ে রাজ্যের অবদানের তুলনায় অনেক গুণ বেশি। তাঁরা সারদা গোষ্ঠীর মতো জালিয়াতদের হাতে টাকা তুলে দিতে বাধ্য হন, কারণ তাঁদের সামনে আর কোনও বিকল্প নেই। অনেকেই ব্যাঙ্কের নাগাল পান না, সেখানে সুদের হারও কহতব্য নয়।

সরকার যদি রাজনৈতিক পন্‌জি স্কিমের রাস্তায় হাঁটার বদলে বিনিয়োগের পরিকাঠামো তৈরি করে দিত, যদি তোলাবাজদের নিয়ন্ত্রণে রাখত, তবে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। হয়তো তখন বিভিন্ন ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংস্থা বাজার থেকে ছোট ছোট সঞ্চয় সংগ্রহ করে লগ্নিকারীদের ঋণ দিত। সেই টাকা পশ্চিমবঙ্গেই লগ্নি করা হত। শিল্প তৈরি হত, তাতে উৎপাদন হত। অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হত। সহজ কথায়, মানুষ যে টাকা জমা রেখেছেন, ব্যবসার দৌলতে তার পরিমাণ বাড়ত। ফলে, বিনিয়োগকারীরা নিজেদের লাভ রেখেও ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পগুলিকে তাদের পাওনা সুদ দিতে পারত। তারা আবার নিজেদের লাভের অঙ্কটুকু কেটে রেখে মানুষকে প্রতিশ্রুত সুদের টাকা, আসলসমেত, ফেরত দিতে পারত। অন্য দিকে, শিল্পের প্রসার হলে শ্রমিকের চাহিদা বাড়ত, মজুরির হারও বাড়ত। তাতে সঞ্চয় আরও বাড়ত, এবং পূর্ববর্ণিত অর্থনৈতিক চক্রটি উন্নয়নের পথে ধাবিত হত।

দুঃখজনক ভাবে, পশ্চিমবঙ্গ এর বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে। এই রাজ্যের রাজনীতিকদের পন্‌জি স্কিম তোলাবাজি এবং চিটিংবাজির জন্য জমি তৈরি করে রেখেছে। এখানে বিনিয়োগ করতে গেলে তোলাবাজ, আর সঞ্চয় করতে গেলে চিটিংবাজের সাঁড়াশি আক্রমণ এড়ানোর উপায় নেই। দরিদ্র মানুষ— তাঁদের সর্বহারা বলেই ডাকুন অথবা মা-মাটি-মানুষই বলুন— তাঁদের জন্য আছে শুধু স্লোগান, মিছিল আর জ্বালাময়ী বক্তৃতা। ভাঙা প্রতিশ্রুতির বিষণ্ণ প্রাঙ্গণে শূন্য অঙ্কের খেলা। রঙ পাল্টে লাল থেকে সবুজ হতে পারে, অথবা নীল-সাদা, কিন্তু শূন্যের সঙ্গে শূন্য যোগ করলে বা গুণ করলে শূন্যই পাওয়া যাবে। এর নড়চড় নেই।

হরেক অপ্রয়োজনীয় খাতে খরচ চলছে— উৎসব, অনুষ্ঠান, ক্লাবে-ক্লাবে টাকা বিলি। এই যে টাকা খরচ হচ্ছে, এটা নিতান্তই পুনর্বণ্টন। এটা নিখাদ সুদীপ্ত সেন মডেল— এক জনের থেকে টাকা নিয়ে তা আর এক জনকে দেওয়া হচ্ছে।

মৈত্রীশবাবু লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ অর্থনীতির শিক্ষক।